ক্রিস্টাল ডিম

এইচ জি ওয়েলস

ক্রিস্টাল ডিম

(The Crystal Egg)

বছরখানেক আগেও ছিল দোকানটা। ছোট্ট এবং অত্যন্ত নোংরা। সেভেন ডায়ালস-এর কাছেই। রোদে-জলে ফিকে হয়ে এসেছিল হলুদ অক্ষরে লেখা নামটা:

–প্রকৃতিপ্রেমিক মি. কেভ।

–পুরানো জিনিসের দোকান।

শোকেসগুলোয় ঠাসা থাকত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। হাতির দাঁত, বেজোড় দাবার খুঁটি, পুঁতি, অস্ত্রশস্ত্র, এক বাক্স চোখ, দুটো বাঘের করোটি, একটা নরকরোটি, পোকায় খাওয়া কয়েকটা খড় আর কাঠের কুঁচো ঠাসা বাঁদর (একটা বাঁদর লম্ফ ধরে আছে), মান্ধাতার আমলের একটা ক্যাবিনেট, অস্ট্রিচের ডিম কয়েকখানা, মাছ ধরার কিছু সরঞ্জাম, একটা অসাধারণ নোংরা, শূন্য কাচের মাছ-চৌবাচ্চা।

ছিল আরও একটা বস্তু, এই গল্প শুরু হওয়ার সময়ে। ডিমের আকারে একতাল ক্রিস্টাল। খুব চকচকে পালিশ করা। দুই ব্যক্তি বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিল একদৃষ্টে। একজন পাদরি। লম্বা, শীর্ণ আকৃতি। অপরজন বয়সে তরুণ। গালে কালো দাড়ি। গায়ের রং কালচে। জামাকাপড় চোখে পড়ার মতো নয়।

ডিমটার দিকে এমনভাবে আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল ছোকরা যেন কেনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে পাদরিকে।

এমন সময়ে দোকানে এল মি. কেভ। সবে চা খেয়ে এসেছে। মাখন আর রুটি লেগে রয়েছে ঝোলা দাড়িতে। দুজন খদ্দের দাঁড়িয়ে ডিম দেখছে দেখেই ঝুলে পড়ল চোয়াল। চোরের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পেছনদিকে এবং আলতো করে ভেজিয়ে দিলে দরজা।

মি. কেভের বয়স হয়েছে। খর্বকায় পুরুষ। ফ্যাকাশে মুখ-চোখ দুটো অদ্ভুত নীল–যেন জল টলটল করছে। চুল ধূসর এবং ময়লা। গায়ে নোংরা ফ্রক-কোট। মাথায় মান্ধাতার আমলের টুপি। পায়ে গোড়ালি ক্ষয়ে চুন-হয়ে-যাওয়া কার্পেট-চটি।

শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজন–মি. কেভও চেয়ে আছে তাদের দিকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো খুচরো বার করে মুচকি হাসল পাদরি–ভাবখানা, কুলিয়ে যাবে এই পয়সাতেই। দেখেই কিন্তু আরও ঘাবড়ে যায় মি. কেভ। মুখ একেবারেই শুকিয়ে গেল দুই খদ্দের দোকানে ঢুকতেই।

গৌরচন্দ্রিকার ধার দিয়েও গেল না পাদরি–দাম জানতে চাইল ডিমটার। ভয়ে ভয়ে পেছনে অন্দরমহলের দরজায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে পাঁচ পাউন্ড দাম হাঁকল মি. কেভ।

এত দাম? হতেই পারে না।–সে কী রাগ পাদরির। হতে যে পারে না, তা কি জানে না মি. কেভ? জেনে-শুনেই হেঁকেছে চড়া দাম। ফলে শুরু হয়ে গেল দর কষাকষি।

কিন্তু কথা না বাড়িয়ে দোকানের দরজা খুলে ধরে মি. কেভ জানিয়ে দিলে, পাঁচ পাউন্ডের এক পাই কম হবে না।

ঠিক এই সময়ে অন্দরের দরজার ওপরকার কাঁচে দেখা গেল একটি স্ত্রী-মুখ। নির্নিমেষে চেয়ে আছে খদ্দের দুজনের দিকে। গলা কেঁপে গেল মি. কেভের।

এতক্ষণ চুপ করে দর কষাকষি শুনছিল ছোকরা। তীক্ষ্ণ চাহনি ঘুরছিল চারদিকে।

হঠাৎ বললে, পাঁচ পাউন্ডই দিন।

আপত্তি জানালে পাদরি। কিন্তু ধোপে টিকল না। ব্যাজার মুখে পকেট হাতড়ে দেখলে, তিরিশ শিলিং-এর বেশি হচ্ছে না। এই সুযোগে বোঝাতে লাগল মি. কেভ, ক্রিস্টাল ডিমটা নাকি বিক্রির জন্য নয়। বিক্রির জন্যে নয় তো দর হাঁকা হল কেন?–জানতে চায় দুই খদ্দের। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মি. কেভ বলে, বিকালেই একজন লোক এসেছিল তো। কিনবে বলে গেছে। তাই একটু দর চড়িয়ে নিরাশ করতে চেয়েছিলাম।

এমন সময়ে খুলে গেল অন্দরের দরজা। দরজার ওপরকার কাচ দিয়ে এতক্ষণ উঁকি দিচ্ছিল যে, দোকানে ঢুকল সে।

স্থূল, কর্কশ-আকৃতি এক স্ত্রীলোক। মি. কেভের চেয়ে বয়স কম–কিন্তু আয়তনে অনেক বড়। ভারী ভারী পা ফেলে মুখ লাল করে বললে, কে বললে, বিক্রি হবে না ক্রিস্টাল ডিম? আলবত হবে। বিক্রির জন্যেই রাখা হয়েছে। পাঁচ পাউন্ড তো ভালো দাম। কেভ, ভদ্রলোকদের ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন শুনি?

বাধা পেয়ে ভীষণ রেগে গেল কেভ। কটমট করে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে কড়া গলায় জানিয়ে দিলে ব্যাবসাটা তার, চালাতে হয় কী করে, সে জ্ঞানও তার আছে।

শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। মজা পেয়ে কেভ-গৃহিণীকে উসকে দিতে থাকে খদ্দের দুজন। বড়ই কোণঠাসা হয়ে পড়ে মি. কেভ বেচারি, কিন্তু গোঁ ছাড়ে না কিছুতেই।

কথা কাটাকাটির অবসান ঘটায় প্রাচ্যের সেই ছোকরা। বিকেল নাগাদ যে লোকটা ক্রিস্টাল ডিম কেনবার আগ্রহ দেখিয়ে গেছে, সে যদি ইতিমধ্যে নিয়ে যায় যাক, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যদি না নেয়, দুদিন পরে এসে পাঁচ পাউন্ড দাম দিয়েই ক্রিস্টাল ডিম নিয়ে যাবে তারা।

বিদেয় হল দুই খদ্দের। চরমে উঠল স্বামী-স্ত্রীর কোঁদল। রাগের মাথায় উলটো-পালটা বকতে থাকে মি. কেভ। একবার বলে, আগে যে কিনতে এসেছে, ক্রিস্টাল ডিম তারই প্রাপ্য। তাহলে পাঁচ পাউন্ড চাইলে কেন? সে কী তম্বি কেভ-গৃহিণীর। ব্যাবসাটা যেন তারই, হুকুম দিতে পোক্ত। তেলে-আগুনে জ্বলে উঠে মি. কেভ শুনিয়ে দিলে মুখের ওপর, আমার ছাগল, আমি মাথায় কাটি কি লেজে কাটি, তোমার কী দরকার?

রাতে খেতে বসে আবার শুরু হল ঝগড়া ক্রিস্টাল ডিম নিয়ে। এবার মায়ের দলে ভিড়েছে মি. কেভের সৎ-ছেলে আর সৎ-মেয়ে। তিনজনের কারওই উচ্চধারণা নেই মি. কেভের ব্যাবসা-বুদ্ধি সম্পর্কে।

সৎ-ছেলের বয়স আঠারো, সৎ-মেয়ের বয়স ছাব্বিশ। বড় তার্কিক।

তেড়েমেড়ে বললে সৎ-ছেলে, বেশি বোঝে। এর আগেও ডিমটা পাচার করার ব্যাপারে আমার মতামতকে পায়ে মাড়িয়ে গেছে।

পাঁচ পাউন্ড কি কম কথা! মন্তব্য প্রকাশ করে সৎ-মেয়ে। পরের ব্যাপারে নাক গলাতে ওস্তাদ।

বেচারা মি. কেভ। তিন-তিনটে তোপের মুখে পড়ে কান-টান লাল করে যুক্তিবুদ্ধি একেবারে গুলিয়ে ফেলল। তাড়া খেয়ে আধ-খাওয়া খাবার ফেলেই সরে পড়ল দোকানঘর বন্ধ করতে। পেছন থেকে শুনল গজগজানি, এদ্দিন ধরে শোকেসে ডিমখানা ফেলে রাখার কোনও মানে হয়?

সত্যিই হয় না। ওইখানেই তো ভুল করে বসেছে মি. কেভ। বিক্রি না করে এখন উপায় নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিপিতাকে আর-এক হাত নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরল সৎ-ছেলে আর সৎ-মেয়ে। গরম জলে লেবু-চিনি মিশিয়ে শরবত খেতে বসল কেভ-গৃহিণী ওপরতলায়। মি. কেভ কিন্তু রয়ে গেল দোকানঘরেই, অনেক রাত পর্যন্ত। কী করল দোকানে, তা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, পরে প্রকাশ করা যাবে। পরের দিন সকালে কেভ-গৃহিণী দেখলে সামনের শোকেস থেকে ডিমটাকে সরিয়ে এনে রাখা হয়েছে মাছ ধরার খানকয়েক পুরানো বইয়ের পাশে, এমন জায়গায় যে খদ্দেরদের চোখে চট করে পড়বে না। মাথা দপদপ করছিল বলে কথা না বাড়িয়ে ডিমটাকে চোখে পড়ার মতো জায়গায় রেখে দিলে কেভ-গৃহিণী। তিলমাত্র বাগড়া দিলে না মি. কেভ। কথাও বলল না।

সারাদিনটা কাটল কিন্তু খিটখিটে মেজাজে। বিকেল নাগাদ যথারীতি ঘুমাতে গেল কেভ গৃহিণী। সেই ফাঁকে শোকেস থেকে ডিমটাকে ফের সরিয়ে দিলে মি. কেভ।

পরের দিন সকালে স্থানীয় স্কুলে মাছ দিয়ে আসতে গেল মি. কেভ ক্লাসে কেটেকুটে বিজ্ঞান শেখানোর জন্যে দরকার। ঠিক ওই সময়ে দোকানে এল কেভ-গৃহিণী ক্রিস্টাল ডিম দেখতে। ডিমটা বিক্রি হয়ে গেলে ওই পাঁচ পাউন্ড কীভাবে খরচ করা হবে, তার একটা ফিরিস্তি খাড়া হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে এর মধ্যেই। খুবই লম্বা ফর্দ। তার মধ্যে আছে। নিজের জন্যে একটা সবুজ সিল্কের পোশাক আর রিচমন্ডে বেড়িয়ে আসা। কিন্তু ডিম দেখবার আগেই উত্তপ্ত মেজাজে দোকানে এল এক খদ্দের। আগের দিন ব্যাং দেওয়ার কথা ছিল, দেওয়া হয়নি কেন? স্বামীমশায়ের এই ব্যাং ব্যাবসাটা কোনওদিনই সুনজরে দেখেনি কেভ-গৃহিণী। ব্যাঙের খদ্দেরকেও তাই মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে বার করে দিলে দোকান থেকে। তারপর দেখতে গেল, ডিমটা ঠিক জায়গায় আছে কি না, ওই ডিমই যে নিয়ে আসবে কড়কড়ে পাঁচটা পাউন্ড... পূর্ণ হবে তার স্বপ্ন।

ও মা! ডিম তো নেই শোকেসে!

সওয়া দুটো নাগাদ ফিরে এসে মি. কেভ দেখলে, মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মরা জানোয়ারের ভেতরে খড়কুটো ঠাসার সরঞ্জাম টেনে নামাচ্ছে তার বউ। দোকানঘর তছনছ। কোনওখানেই দেখতে বাকি রাখেনি কেভ-গৃহিণী। স্বামীরত্নকে দেখেই ঝাঁপাই জুড়াল চোখ পাকিয়ে–আস্পদ্দা তো কম নয়! লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

লুকিয়ে রেখেছি? কী বল তো?

ন্যাকা আর কী! ডিমটা... ডিমটা... কোথায় রেখেছ?

ডিম! শোকেসের সামনে ছুটে গিয়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল মি. কেভ–কী আশ্চর্য! গেল কোথায়?

ঠিক সেই সময়ে খেতে এসে খাবার না পেয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দোকানে ঢুকল মি. কেভের সৎ-ছেলে। ক্রিস্টাল ডিম নিপাত্তা হয়েছে শুনে রাগটা মায়ের ওপর থেকে সরে এসে পড়ল বিপিতার ওপর। মা আর ছেলে মিলে নির্মমভাবে দুষতে থাকে মি. কেভকে–পাছে বেচতে হয়, তাই লুকিয়ে রেখেছে নিজেই। পালটা অভিযোগ নিয়ে এল মি. কেভ–টাকার লোভে নিশ্চয় তাকে না জানিয়ে বেচে দেওয়া হয়েছে ক্রিস্টাল।

ফলে লাগল তুমুল ঝগড়া। ঝগড়ার পর দেখা গেল, মৃগীরুগির মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রণে ভঙ্গ দিচ্ছে কেভ-গৃহিণী। আর, কর্মক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা দেরি করে পৌঁছাল সৎ-ছেলে। ক্ষিপ্ত বউকে আর না ঘাঁটিয়ে দোকানে বসে মাথা ঠান্ডা করতে লাগল মি. কেভ।

সন্ধের সময়ে আবার খাওয়ার টেবিলে শুরু হল চেঁচামেচি। এবার আক্রমণ চলল সৎ মেয়ের নেতৃত্বে। সহ্য করতে না পেরে দড়াম করে দরজা খুলে চম্পট দিল মি. কেভ। সেই ফাঁকে চিলেকোঠা থেকে পাতাল কুঠুরি পর্যন্ত সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখেও ক্রিস্টাল ডিমকে কিন্তু পাওয়া গেল না।

পরের দিন খদ্দের দুজন দোকানে আসতেই সজল চোখে কেভ-গৃহিণী তাদের খাতির করে বসিয়ে ইনিয়েবিনিয়ে শুনিয়ে দিলে তার অসীম দুঃখ-দুর্দশার নানান কাহিনি। সবার

মূলে ওই মি. কেভ। জীবনটা নাকি মাঠে মারা যেতে বসেছে কেভের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পর থেকে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। তাকে তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছেই, ক্রিস্টাল ডিমটাকে নিয়েও কী খেলাই না খেলছে। কেভের সারাজীবনটাই এইরকম নষ্টামিতে ভরতি। পাদরি সাহেব যদি ঠিকানাটা দিয়ে যান, তাহলে বাড়ি বয়ে গিয়ে একদিন শুনিয়ে আসবে। সকৌতুকে সব শুনে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল পাদরি। কিন্তু সে ঠিকানা হারিয়ে যাওয়ায় পাদরিকে আর খুঁজে পায়নি কেভ-গৃহিণী।

সন্ধে হলে দম ফুরিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল গোটা কেভ পরিবার। মি. কেভকে একা একাই খেতে হল রাতের খাবার–আগের দুরাতের ঝড় বইল না খাওয়ার টেবিলে। পুরো বাড়িটা কিন্তু থমথম করতে লাগল এই ব্যাপারের পর থেকে।

ক্রিস্টাল ডিম কিন্তু আর ফিরে এল না–এল না খদ্দেররাও।

কেচ্ছাকাহিনির মধ্যে না গিয়ে এককথায় বলা যায়, মি. কেভ পয়লা নম্বরের মিথ্যুক, ক্রিস্টাল ডিমটা সরিয়েছিল সে নিজেই। মাছের থলির মধ্যে করে নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছিল সেন্ট ক্যাথরিনস হসপিটালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিমনস্ট্রেটর মি. জ্যাকোবি ওয়েসের কাছে। ক্রিস্টাল ডিম রয়েছে সেখানেই–আমেরিকান হুইস্কির পাশে কালো ভেলভেট-ঢাকা অবস্থায়। সব কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি মি. ওয়েস। তবে কেভ-দম্পতির মধ্যে যে নিরন্তর খিটিরমিটির লেগেই আছে–তা জানত, মি. কেভের মুখেই শুনেছিল। মিসেস কেভকেও দেখেছিল, বিচিত্র চরিত্র ভালো লাগত বলেই মি. কেভকে তার ভারী পছন্দ। তাই ক্রিস্টাল ডিম রেখে দিতে আপত্তি করেনি। সামান্য একটা ডিমের ওপর কেন মি. কেভের মায়া পড়ে গেছে, তা পরে বিস্তারিতভাবে বলবে বলেছিল ভদ্রলোক।

তবে হ্যাঁ, ডিমের মধ্যে নাকি মরীচিৎকার মতো অনেক ছায়াবাজি সে দেখেছে–সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

এই কাহিনি মি. ওয়েসের মুখেই শোনা। সুতরাং মি. কেভের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সন্ধের দিকে মি. ওয়েসের কাছে ফের গিয়েছিল মি. কেভ। শুনিয়েছিল রহস্যনিগুঢ় এক কাহিনি। ক্রিস্টাল ডিমটা তার হাতে এসেছিল অন্যান্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে এক কিউরিয়ো দোকানির কাছ থেকে–দেনার দায়ে জলের দামে বেচে দিয়েছিল সমস্ত হাবিজাবি জিনিস। ডিমটার মূল্যায়ন করা তখন সম্ভব হয়নি বলে মি. কেভ দীর্ঘদিন দশ শিলিং-এর টিকিট ঝুলিয়ে রেখেছিল ডিমের গায়ে। তারপর যখন ভাবছে, দামটা আরও কমানো যায় কি না, এমন সময়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল অদ্ভুত একটা আবিষ্কারের পর।

শরীর তখন খুবই খারাপ যাচ্ছে মি. কেভের। এই ঘটনার গোড়া থেকেই স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু হয়েছিল ভদ্রলোকের। নিজেও গা করেনি। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙেছে মনও। স্ত্রী আর সৎ ছেলেমেয়ে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার চালিয়ে গেছে স্বাস্থ্যভঙ্গ সত্ত্বেও, গুণের শেষ নেই বউয়ের, এক নম্বরের দাম্ভিক, স্বামীর জন্যে তিলমাত্র সহানুভূতি নেই মনে, অত্যন্ত খরুচে। লুকিয়ে-চুরিয়ে মদও খায়। সৎ ছেলেমেয়ে দুটোই নীচ প্রকৃতির বিপিতা যে চোখের বালি–তা সোজাসুজি জানাতে দ্বিধা করেনি কোনওদিনই। ব্যাবসার চাপে মি. কেভও নিশ্চয় মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। রুপোর চামচ মুখে দিয়ে ধরায় আগমন ঘটেছিল ভদ্রলোকের, পেটে মোটামুটি বিদ্যেও আছে। মাসের পর মাস মানসিক

অত্যাচার সইবার ফলে ঘুমাতে পারত না রাত্রে। বিষণ্ণ হয়ে থাকত সারাদিন। পাছে কেউ বিরক্ত হয়, তাই গভীর রাতে শয্যা ছেড়ে উঠে ঘুরঘুর করত বাড়িময়, একদিন রাত তিনটের সময়ে ঢুকেছিল দোকান ঘরে।

অন্ধকার ঘর, অথচ চাপা দ্যুতি দেখা যাচ্ছে একদিকে। শোকেসের দিকে। ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সরু আলোকরেখা পড়েছে ক্রিস্টাল ডিমের ওপর এবং ঝলমল করছে ডিম্বাকার ক্রিস্টাল। আলোকরেখা যেন আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুলেছে ক্রিস্টালের ভেতরটা।

দেখেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মাথচাড়া দিয়েছিল মি. কেভের মনে। বিজ্ঞান সে পড়েছে–বিজ্ঞানকে ভাঙিয়েই তার যা কিছু রোজগার। খটকা লেগেছিল সেই কারণেই। ক্রিস্টালের মধ্যে আলোক প্রতিসরণ হয় কী করে, তা তার জানা। কিন্তু ক্রিস্টালের মধ্যে আলো ছড়িয়ে পড়ে কী করে, তা তো জানা নেই!

ক্রিস্টালটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আরও বেশি গুলিয়ে গেল মাথাটা। আলো স্থির নয়–যেন সরে সরে যাচ্ছে ক্রিস্টালের মধ্যে। তালগোল পাকিয়ে যেন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে!

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ক্রিস্টাল নয়, যেন দ্যুতিময় বাষ্প-ভাত ফোঁপরা কাচের বর্তুল!

আচমকা আলোকরেখা আর ক্রিস্টালের মাঝখানে এসে পড়েছিল মি. কেভ। তা সত্ত্বেও দ্যুতি কমেনি ডিমটার। ঝলমলে ক্রিস্টাল ডিম নিয়ে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকারে যাওয়ার পরেও দেখা গেছে, আলো যেন ফেটে পড়ছে আশ্চর্য ক্রিস্টালের ভেতরে। মিনিট চার-

পাঁচ ঝলমলে থাকার পর আস্তে আস্তে ফিরে এসেছে দ্যুতি। একেবারে নিবে যাওয়ার পর আবার খড়খড়ির সামনে আলোকরেখার সামনে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে আলো ঝলমলে হয়ে উঠেছে আজব ক্রিস্টাল।

অদ্ভুত উপাখ্যানের এই অংশটুকু কিন্তু যাচাই করা হয়েছে-মিথ্যে বলেনি মি. কেভ। এক মিলিমিটারের সরু ব্যাসের আলোকরেখার সামনে ক্রিস্টাল ডিম রেখে একই কাণ্ড দেখেছে মি. ওয়েস। সবার চোখে সমানভাবে কিন্তু ধরা দেয়নি আশ্চর্য ক্রিস্টালের অত্যাশ্চর্য আলোকপ্রভা। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক মি. হারবিঞ্জার কিছুই দেখেননি। মি. ওয়েস দেখেছে বটে–কিন্তু মি. কেভের মতো নয়। মি. কেভও শরীর যখন খুব খারাপ গিয়েছে, ক্লান্তিতে যখন ভেঙে পড়েছে–তখনই অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখেছে। ক্রিস্টালের ভেতরকার আজব কাণ্ডকারখানা।

প্রথম থেকেই মি. কেভ কিন্তু অবিশ্বাস্য এই অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলতে সাহস পায়নি–বেমালুম চেপে গিয়েছে। অষ্টপ্রহর যাকে দাঁতে পেষা হচ্ছে, তার পক্ষে এরকম লুকোচুরি খুবই স্বাভাবিক। বললেই তো অত্যাচার বাড়ত। তাই ফাঁক পেলেই ক্রিস্টাল ঘুরিয়ে দেখত একাই-কাকপক্ষীকেও জানায়নি। ক্রিস্টাল যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। লক্ষ করেছে, ভোরের আলো ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টালের আলো অন্যের চোখে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন জিনিসটা নেহাতই একটা ক্রিস্টাল ডিম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু রাত ঘনিয়ে এলেই তার ওপর আলো ফেললে জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন ডিমটা। দিনরাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে আরও অনেক আবিষ্কার করেছে মি. কেভ। যেমন, দিনের বেলাতেও বিশেষ কোণ থেকে দেখলে অন্ধকারের মধ্যেও আলোময় ক্রিস্টালের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত দৃশ্য।

সবচেয়ে ভালো দেখা যায় বিকেলের দিকে। খাণ্ডারনি বউ যখন খেয়েদেয়ে নাক ডাকাত ওপরে, মি. কেভ তখন কাউন্টারের তলায় কালো ভেলভেট ডবল ভাঁজ করে মাথা মুখের ওপর ঢেকে চেয়ে থাকত ক্রিস্টালের দিকে। এইখানেই একদিন দেখলে, আলোকরেখা থেকে ১৩৭ ডিগ্রি কোণে চোখ রাখলে ক্রিস্টালের মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত একটা দেশ। নিছক ছবি নয়, যেন প্রাণস্পন্দনে ভরপুর একটা দৃশ্য। যেন সত্যিই সে দেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মি. কেভনড়ে নড়ে যাচ্ছে ছবিটার মধ্যে অনেক জিনিস। আলো যত ভালোভাবে পড়ে, চারদিক যত অন্ধকার হয়–আশ্চর্য সেই জীবন্ত দৃশ্য ততই স্পষ্ট দেখা যায়। আলোকরেখা বা চোখের অবস্থানে তিলমাত্র হেরফের ঘটলেই জীবন্ত দৃশ্যটাও পট পালটায়। যেন একটা গোল কাচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে আছে সত্যিকারের প্রাণময় জীবনধারার দিকে–প্রাণচাঞ্চল্যে স্পন্দিত সেই দেশের হরেকরকম দৃশ্যপট ঝলক দিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিকোণ এবং আলোকব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথম যখন এই দৃশ্য দেখেছিল মি. কেভ, তখন তা ক্ষণেকের জন্যে ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল–অস্পষ্ট কুয়াশার আড়ালে যেন ঢেকে গিয়েছিল। বিশাল একটা তেপান্তরের মাঠের দিকে যেন চেয়ে আছে ভদ্রলোক। চেয়ে আছে ওপর থেকে নিচে। খুব উঁচু বাড়ি বা মাস্তুলের ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে বহু দূরের বহু দৃশ্য যেমন একসঙ্গে দৃষ্টিসীমায় জেগে ওঠে–ঠিক সেইভাবে দেখেছিল একসঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের দৃশ্য। পরিচিত তারা দেখে বুঝতে পেয়েছিল কোনদিকটা উত্তর, আর কোনদিকটা দক্ষিণ। পূর্ব আর পশ্চিমে বহু দূরে রয়েছে আকাশছোঁয়া লালচে খাড়া পাহাড়–কোথায় যেন এর আগেও দেখেছে এই পাহাড় মি. কেভ, চেনা চেনা মনে হয়েছে, কিন্তু মনে করতে পারেনি। উত্তর আর দক্ষিণেও ঘুরে এসেছে লালচে পাহাড়।

পাহাড়বেষ্টিত ধু ধু প্রান্তরে সঞ্চরমাণ অনেক কিছুই। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে বিশাল উঁচু বাড়ির পর বাড়ি। অদ্ভুত আকারের ঘন শেওলা-সবুজ গাছপালা। কয়েকটা গাছ উৎকৃষ্ট ধূসর। দেখা যাচ্ছে একটা চকচকে খাল। মি. কেভ রয়েছে পূর্বদিকের পাহাড়ের কাছে। পাহাড় পেরিয়ে যেন একদল পাখি উড়ে আসতে আসতে প্রতিসরিত আলোর অস্পষ্টতায় মিলিয়ে গেল। সুস্পষ্টভাবে আর দেখা গেল না। তখন সূর্য উঠছে পাহাড়ের ওপর। সূর্যের সামনে কালো ছায়ার মতো উড়ুক্কু বস্তুগুলোকে পাখি বলেই মনে হয়েছিল মি. কেভের। তারপরেই ঝলমলে রঙিন বিশাল একটা বস্তু উড়ে গেল ছবির ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে। প্রথমবার দেখেই হাত কেঁপে গিয়েছিল ভদ্রলোকের, মাথা সরে গিয়েছিল। দৃশ্যপট কুয়াশা-আবিল হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে অনেক সময় নিয়ে আবার তা দেখতে পেয়েছিল পরে।

মি. ওয়েসের কাছে শুনেছি, মি. কেভের এই অভিজ্ঞতায় নাকি বাড়াবাড়ি নেই মোটেই। যদিও অনেক চেষ্টা করেও মি. কেভের মতো পরিষ্কারভাবে সেই দৃশ্য দেখতে পায়নি মি. ওয়েস–তা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতাকে ভাবাবেগে আচ্ছন্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটাও ঠিক যে, মি. কেভের কাছে যা সুস্পষ্ট দৃশ্য, মি. ওয়েসের কাছে তা ধোঁয়াটে নীহারিকার মতো দৃশ্যপট ছাড়া আর কিছুই নয়।

দৃশ্যটা আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দিন সাতেক পরে। এই সাত দিনে তেপান্তরের মাঠে ভাসা-ভাসা অনেক কিছুই চোখে পড়েছিল। কিন্তু প্রতিবারেই কেন জানি মনে হয়েছিল, একই জায়গায় থেকে অদ্ভুত এই দৃশ্যপটের দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে মি. কেভ। দৃষ্টিকোণ পালটালেই এক-একদিকের দৃশ্য ফুটে উঠছে চোখের সামনে। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট বাড়ির অসম্ভব দীর্ঘ ছাদ। ছাদের মাঝখানে রয়েছে

অনেকগুলো উঁচু খুঁটি। প্রত্যেকটা খুঁটির ডগায় সূর্যের আলোয় চকচক করছে একটা করে খুদে জিনিস। খুঁটিগুলো সমান দূরত্বে, নিয়মিত ব্যবধানে খাড়া ছাদের ঠিক মাঝখানে। চকচকে খুদে জিনিসগুলো যে আসলে কী, তা পরে বুঝেছিল মি. কেভ। বাড়ির পরেই নিবিড় গাছপালা। তারপর ঘাস-ছাওয়া মাঠের ওপর গুটিগুটি নড়ছে গুবরেপোকার মতো অনেকগুলো প্রাণী আয়তনে যদিও প্রকাণ্ড। মাঠের পরেই গোলাপি পাথর-বাঁধাই একটা রাস্তা। রাস্তার ওপারে দূরের পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত একটা নদী। দুপাশে ঘন লাল ঝোপ। নদীর জল চকচকে আয়নার মতো। উপত্যকার একদিক থেকে আরেকদিকে চলে গিয়েছে এই চওড়া নদীপথ। বাতাস যেন মথিত বহু পাখির ডানাসঞ্চালনে। ঘুরছে গোল হয়ে। নদীর ওপারে অসংখ্য আকাশছোঁয়া প্রাসাদ। উজ্জ্বল রঙিন এবং যেন চকচকে ধাতু দিয়ে কারুকাজ করা। আশপাশে শেওলা-সবুজ অরণ্য। আচমকা কী যেন ডানা ঝাঁপটিয়ে চলে এসেছিল চোখের সামনে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল মি. কেভের মুখের সামনে। যেন রত্নখচিত হাত-পাখা সঞ্চালন অথবা ডানা ঝাপটানির সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সেই মুখের ওপরের অংশ, অর্থাৎ শুধু দুটো বিশাল চোখ চলে এসেছিল মি. কেভের চোখের একদম সামনে–এত কাছে যেন ক্রিস্টাল ডিমের ঠিক উলটোদিকে। আঁতকে উঠে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল মি. কেভ। আবার ফিকে হয়ে এসেছিল ক্রিস্টাল। অন্ধকার দোকানঘরে পরিচিত মিখাইল আর সোঁদা সোঁদা গন্ধের মধ্যে বসে ঘেমে গিয়েছিল ভদ্রলোক। নিবিষ্ট হয়ে থাকায় এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, বসে রয়েছে নিজের দোকানেই–অন্য জগতে নয়।

ক্রিস্টাল ডিমের ভেতরের আশ্চর্য দেশ যেন পেয়ে বসেছিল মি. কেভকে সেই থেকেই। সময় পেলেই উঁকি মেরে দেখত ক্রিস্টালের ভেতরে। যেমন নতুন খেলনা নিয়ে তন্ময় থাকে শিশু–অন্য কোনওদিকে হুঁশ থাকে না, কারও হাতে খেলনা ছাড়তে চায় না–মি.

কেভের অবস্থাও হয়েছিল সেইরকম। প্রথমদিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাই সহজ-সরলভাবে খোলাখুলি শুনিয়েছিল মি. ওয়েসকে। আজব ক্রিস্টাল হঠাৎ আবির্ভূত খদ্দেরদের হাতে পাচার হওয়ার সম্ভাবনা ঘটতেই অস্থির হয়ে উঠেছিল। তুমুল ঝগড়া লেগেছিল বাড়িতে। অত্যাচার চলেছিল মনের ওপর।

কিন্তু মি. কেভের মতো ক্রিস্টাল দুনিয়া নিয়ে ছেলেমানুষের মতো ভুলে থাকতে পারেনি মি. ওয়েস। বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তদন্তকারীর মতোই পদ্ধতিমাফিক অবিশ্বাস্য এই নয়া জগৎকে খুঁটিয়ে দেখতে প্রয়াসী হয়েছিল বিজ্ঞানীদের মতোই। আলোকরেখা কখন পড়বে ক্রিস্টালে–এই ভরসায় না থেকে বৈদ্যুতিক আলো ফেলার ব্যবস্থা করেছিল ক্রিস্টাল ডিমে। মোটা ভেলভেট চাপা দেওয়ার চাইতে উন্নততর ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়ে এবং ক্রিস্টালকে ঠিক কোনদিক থেকে দেখলে দৃশ্যাবলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তা আবিষ্কার করার পর থেকে ক্রিস্টাল জগতের সব দৃশ্যই যখন খুশি দেখতে পেত মনের আশ মিটিয়ে।

মি. ওয়েস দেখত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে–মি. কেভও আসত প্রায় রোজই-কল্পনা-রঙিন মনোজগতের খোরাক জোগানোর জন্যে। যেহেতু দেখার ব্যাপারে ভদ্রলোকের ক্ষমতা ছিল মি. ওয়েসের চাইতে বেশি, তাই গড়গড় করে বলে যেত মি. কেভ আশ্চর্য দেশের অদ্ভুত বৃত্তান্ত–অন্ধকারেও লেখার অভ্যেস থাকায় সেই বর্ণনা খুঁটিয়ে লিখে নিত মি. ওয়েস। লিখেছিল বলেই এই কাহিনি লেখবার সুযোগ এসেছে।

পাখির মতো উড়ুক্কু প্রাণীগুলো সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল মি. কেভের মনকে। প্রথমে মনে হয়েছিল এক জাতের বাদুড়। তারপর মনে হল পরি-টরি নয় তো? মাথাটা

গোলাকার–অনেকটা মানুষের মাথার মতো। চওড়া রুপোলি ডানায় কিন্তু পালক নেই–পাখি, বাদুড়ের ডানার নকশায় নির্মিত নয় মোটেই। মরা মাছের মতোই চকচকে রং ঝলমলে পাখা বরাবর রয়েছে বাঁকা পাঁজরা–যেমনটা থাকে প্রজাপতির ডানায়। দেহটা ছোট। কিন্তু মুখের কাছে আছে দুগুচ্ছ শুড়, এদেরই একজনের বিশাল চোখ দেখে প্রথমদিকে অমন আঁতকে উঠেছিল মি. কেভ।

মি. ওয়েসের কেন জানি মনে হয়েছিল, আশ্চর্য দেশের বাগান, বাড়ি, খুঁটি–সবকিছুরই প্রভু কিন্তু এই উড়ুক্কু জীবেরা। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করত তারা অদ্ভুত পন্থায়। দরজা দিয়ে নয়। দরজার বালাই ছিল না বিশাল বাড়িগুলোয়। ছিল বিস্তর গোলাকার গবাক্ষ। উড়ুক্কু প্রাণীগুলো শুড়ের ওপর ভর দিয়ে টুক করে নামত জানলার সামনে, ডানা মুড়ে পাশে গুটিয়ে আনত সরু রডের আকারে, তারপর ছোট্ট লাফ মেরে ঢুকে যেত ভেতরে। ছোট ডানাওয়ালা বিস্তর প্রাণী ঘুরত এদের সঙ্গে। অনেকটা বিশালকায় গঙ্গাফড়িঙের মতো। অথবা মথ আর উড়ুক্কু গুবরেপোকার মতো। খোলা লনে গুটিগুটি ঘুরে বেড়াত রং ঝলমলে দানবিক গুবরেপোকাসদৃশ ডানাহীন প্রাণী। পথে আর ছাদেও দেখা যেত উড়ুক্কু প্রাণীদের মতো প্রাণী–ডানা বাদে। মাথা বিরাট। শুড়ের ওপর হাতের মতো ভর দিয়ে লাফ দিয়ে ঘুরত ছাদে, রাস্তায়, লনে।

খুঁটির মাথায় চকচকে বস্তুগুলো নিয়েও মাথা ঘামিয়ে চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে এসেছিল মি. ওয়েস। দেখেছিল, বিশটা খুঁটি অন্তর একটা করে খুঁটির মাথায় রয়েছে চকচকে বস্তুগুলো। মাঝে মাঝে ডানাওয়ালা উড়ুক্কু প্রাণীরা এসে শুড় দিয়ে খুঁটির ডগা জড়িয়ে ধরে চেয়ে থাকে চকচকে বস্তুগুলোর দিকে।

দেখেই খটকা লেগেছিল। তবে কি ক্রিস্টাল ডিমের মতোই অগুনতি ডিম বসানো রয়েছে খুঁটির মাথায়? এখানকার ডিম দিয়ে যেমন ওখানকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, ওখানকার ডিমের মধ্যেও কি তেমনি এখানকার দৃশ্য ফুটে উঠছে? এখানকার ডিম যেখানে খুশি বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়–ওখানকার ডিম কিন্তু খুঁটির ডগায় আটকানো। এইরকম ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে অন্য জগতের এক বাসিন্দা কি দেখতে পেয়েছিল মি. কেভকে? তার বিশাল চোখ দেখেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল মি. কেভের। তবে কি এখানকার ক্রিস্টাল একই সঙ্গে অবস্থান করছে দুটো জগতে? দুটো ক্রিস্টালের মধ্যে যোগসাজশ আছে? পৃথিবীজোড়া কাণ্ডকারখানার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাবনাটাকে একান্ত সম্ভবপর বলেই মনে হয়–অন্তত আমার কাছে।

আশ্চর্য এই জগৎটা তাহলে রয়েছে কোথায়? অচিরেই এই প্রশ্নের জবাব জুগিয়ে দিয়েছিল মি. কেভ। ভারী হুঁশিয়ার লোক। যা দেখে তা ভোলে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল বলেই জানা গিয়েছিল আশ্চর্য সেই জগতের ঠিকানা।

চোখ পাকিয়ে একদিন ক্রিস্টালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মি. কেভ দেখলে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে আশ্চর্য জগতে; তারা দেখা যাচ্ছে কালো আকাশে। তবে আকাশ যেন আরও কালচে। তারাগুলোও চেনা–সৌরজগতে যেসব নক্ষত্রমণ্ডলী দেখা যায়–সেইগুলোই, তবে রয়েছে আরও দূরে। অদ্ভুত এই জগৎ তাহলে রয়েছে সৌরজগতেই পৃথিবী থেকে আরও কয়েক কোটি মাইল দূরে, তাই সূর্যকে আরও ছোট দেখিয়েছে দিনের বেলা–আকাশকে মনে হয়েছে আরও ঘন নীল। এই সূর্যই সেদিন ডুব দিতেই দু-দুটো চাঁদকে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে আকাশে!

হ্যাঁ, জোড়া চাঁদ। উত্তেজিতভাবে মি, কেভ বলেছিল, আমাদের চাঁদা মামার মতোই তাদের দেখতে। তবে আয়তনে অনেক ছোট। দুটোর একটা এত জোরে ছুটছে যে, শুধু চোখেই ছোটার বেগ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ দুটো চাঁদই গ্রহের এত কাছে রয়েছে যে, দিকরেখা ছাড়িয়ে বেগে উঠে আসতে-না-আসতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়ে যাচ্ছে!

সৌরজগতে একটি গ্রহের ক্ষেত্রেই এইসব তথ্যপঞ্জি মিলে যায়। নাম তার মঙ্গল গ্রহ!

ডানাওয়ালা জীবগুলো তাহলে মঙ্গলগ্রহী। ডানা যাদের নেই, কিন্তু বাদবাকি চেহারা একই রকম–তারা তাহলে কে? তারাও কি মঙ্গলগ্রহী? কৃত্রিম ডানা লাগিয়ে উড়ে বেড়ায় দরকারমতো?

ডানা থাকুক আর না থাকুক, এরাই যে মঙ্গল গ্রহের প্রভু, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদঘুটে দুপেয়ে একজাতীয় জীবকে শেওলা বৃক্ষ খেতে দেখেছিল মি. কেভ। দেখতে অনেকটা নর-বানরের মতো। দেহ আংশিক স্বচ্ছ। হঠাৎ শুড় বাড়িয়ে তেড়ে এল ডানাহীন একটা মঙ্গলগ্রহী। হুটোপাটি করে পালিয়েও আংশিক স্বচ্ছ দুপেয়েরা রক্ষে পায়নি। শুড় বাড়িয়ে একজনকে সাপটে ধরেছিল গুবরেপোকার মতো মঙ্গলগ্রহী। তারপরেই ক্রিস্টাল অস্পষ্ট হয়ে আসায় আর কিছু দেখা যায়নি। কিন্তু ঘাম ছুটে গিয়েছিল মি. কেভের।

আর-একটা চলমান বস্তু দেখেছিল মি. কেভ। হনহন করে আসছিল রাস্তা বেয়ে। কাছাকাছি আসতেই দেখা গিয়েছিল ধাতুর জটিল চকচকে কলকবজা। পরক্ষণেই দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়েছিল চলমান রহস্য।

মঙ্গলগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনেক চেষ্টা করেছে মি. কেভ। পৃথিবীর দৃশ্য নিয়ে যেন সন্তুষ্ট নয়, অথবা যেন যা দেখা যাচ্ছে তা মনের মতো নয়–এরকম ভাব দেখা দিয়েছে বিশাল চোখে। তাই একদিন গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল মি. কেভ নজর কাড়ার জন্যে বিশাল চোখ দুটো এক্কেবারে সামনাসামনি দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আলো-টালো জ্বেলে নানারকম ইশারা ইঙ্গিত করেছিল। কিন্তু পলকের মধ্যেই সরে গিয়েছিল মঙ্গলগ্রহী– অন্য খুঁটির ডগায় চোখ রেখেছিল। মি. কেভের অস্তিত্ব যেন টেরই পায়নি।

নভেম্বর মাসটা গেল এইভাবে। ডিসেম্বরের গোড়ায় পরীক্ষার চাপে মি. ওয়েস সময় দিতে পারেনি দিন সাতেকের মতো। এই ফাঁকে ক্রিস্টাল সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরত মি. কেভ–বাড়ির হাঙ্গামা ততদিনে ঝিমিয়ে এসেছিল। দিন দশ-এগারো পরে ক্রিস্টালের জন্যে মনটা হু হু করে ওঠায় মি. ওয়েস নিজেই দৌড়েছিল মি. কেভের বাড়ি।

গিয়ে দেখলে, বন্ধ হয়ে গেছে দোকান। কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এল মিসেস কেভ। পরনে কালো পোশাক।

মি. কেভ? এখন পরলোকে। এইমাত্র কবরখানা থেকেই ফিরছে মিসেস কেভ।

মি. ওয়েসের কাছ থেকে ক্রিস্টাল নিয়ে আসবার পরের দিন খুব ভোরবেলায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় মি. কেভকে। শক্ত, আড়ষ্ট আঙুলের ফাঁকে ধরা ছিল ক্রিস্টাল ডিমটা–পায়ের কাছে লুটাচ্ছিল কালো ভেলভেটটা–যা দিয়ে মাথা-মুখ চাপা দিত মি. কেভ। ক্রিস্টালের ভেতর দিয়ে অন্য জগতের দৃশ্য দেখার সময়ে।

মরে কাঠ হয়ে গেলেও মি. কেভের মুখে নাকি তৃপ্তির হাসি লেগে ছিল। যেন অনেক সুখ, শান্তি নিয়ে এসেছে মরণ।

শরীর তার খারাপ যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন–চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল মি. ওয়েসের। না করার ফলেই তো এই কাণ্ড। মনটা তাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের। তা সত্ত্বেও খোঁজ নিয়েছিল ক্রিস্টাল সম্বন্ধে। আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল মিসেস কেভের জবাব শুনে।

বেচে দেওয়া হয়েছে ক্রিস্টাল ডিম। মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বউ ডিমটা নিয়ে ওপরতলায় গিয়ে খুঁজেছিল পাদরির ঠিকানা। ঠিকানা আর পাওয়া যায়নি। কড়কড়ে পাঁচ পাউন্ড এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পাগলের মতো ছুটেছিল আরেক দোকানদারের কাছে–দোকানের হাবিজাবি জিনিস বেচে সেই টাকায় ধুমধাম করে মালিককে গোর দিতে হবে। ধুরন্ধর সেই দোকানদার জলের দামে ক্রিস্টাল ডিম সমেত অনেক জিনিসই কিনে নিয়ে গেছে।

মি. ওয়েস তৎক্ষণাৎ দৌড়েছিল তার কাছে। দুঃসংবাদ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। ডিমটা এই তো সেদিন বিক্রি হয়ে গেল। লম্বামতো একটা লোক কিনে নিয়ে গেছে–জামা-প্যান্ট ধূসর রঙের। কোনদিকে গেছে, কোথায় থাকে–তা তো জানা নেই। দোকানদারের।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও লাভ হয়নি। কেউ সাড়া দেয়নি। যে কিনেছে, সে নিশ্চয় কিউরিয়ো-সংগ্রাহক নয়। হলে বিজ্ঞাপন পড়ে সাড়া দিত। খেয়ালের বশে কিনে নিয়ে

গিয়ে এই লন্ডন শহরেই হয়তো কাগজ-চাপা করে টেবিলে রেখে দিয়েছে। ক্রিস্টালের মহিমা এখনও জানে না।

মি. ওয়েসের কাছে লেখা বিবরণগুলো ছিল। বিষয়টি দুটো পত্রিকায় প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দুটো পত্রিকাই এসব গালগল্পে কান দেয়নি।

তাই কাগজপত্র এল আমার হাতে। এ কাহিনি আমি লিখলাম গল্পের আকারে। মনে মনে। কিন্তু মি. ওয়েসের সঙ্গে একমত। আশ্চর্য সেই জগৎ মঙ্গল গ্রহ নিঃসন্দেহে। মঙ্গলগ্রহীরাই ক্রিস্টালটাকে পাঠিয়েছে পৃথিবীতে–ক্রিস্টালের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দৃশ্য দেখবার জন্যে। হয়তো তাদের কেউ কেউ এসেছে এই গ্রহে। এটা ঘটনা, কল্পনা নয়, মরীচিকা নয়।

দীর্ঘদেহী ধূসরবেশী লোকটা কে, তা আজও জানা যায়নি। তবে পাদরি আর তার সঙ্গী তরুণের হদিশ পাওয়া গেছে। পাদরির নাম রেভারেন্ড জেমস পার্কার। সঙ্গী তরুণটি জাভার বোসেন-কুনির যুবরাজ। মি. কেভ ক্রিস্টাল বেচতে অনিচ্ছুক দেখেই চড়া দামে বস্তুটি দখলে আনতে চেয়েছিল–আর কোনও উদ্দেশে নয়।

ক্রিস্টাল যেখানেই থাকুক–তার সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ রয়েছে মঙ্গল গ্রহের জুড়ি ক্রিস্টালের–এটাও একটা ঘটনা, অলীক কল্পনা নয়!